৭

দিলের কান্না থামছেনা কিছুতেই। রাত্রি তাকে কোলে নিয়ে হাসপাতালের সামনের পার্কে এলো হাটতে। সে দিলের সাথে নানান রকমের মজার কথা বলছে। অথচ, দিলের কান্না থামছেনা। সে পার্কে ফুটে থাকা ফুল, গাছের ডালে বসে থাকা পাখি দেখিয়ে, কান্না থামাতে বলছে। কে শোনে কার কথা। অবশেষে, সে মুখ ভ্যাংচিয়ে, ঠোট বাঁকিয়ে, গলা থেকে বিভিন্ন শব্দ বেড় করে, অঙ্গ ভঙ্গীর মাধ্যমে আপনমনে, দিলের কান্না থামাতে চাইছে। এই ব্যাপারটা ভালো কাজ করলো। রাত্রির উদভট অঙ্গ ভঙ্গী, আর বিকৃত গলার শব্দে, দিল মনে হয় অবাক হয়ে কান্না থামিয়ে, চুপ করে গেলো। শুধু তাই নয়, আশে পাশের লোকজন ও এসে ভীর করেছে, রাত্রির চারি পাশে। রাত্রি চারিদিক তাকাতেই দেখলো সবাই কেমন কৌতূহলী চোখে তাঁকিয়ে আছে তার দিকে। রাত্রি লজ্জা পেয়ে গেলো। সে দিলকে নিয়ে এখান থেকে পালানোর কথা ভাবলো।

আহমেদ তিনশ এগার নম্বর কক্ষের রোগীদের অবস্হা দেখতে এলো। সুমি তার সাথে সাহায্যের জন্যে গেলো। আহমেদ বাবুলের বুকের দিকে কাটা অংশের ব্যাণ্ডেজটা খোলে সেলাইটা পরীক্ষা করছিলো। সুমি বললো, ডাঃ আহমেদের বুঝি রাত্রিকে খুবই পছন্দ, তাই না?

আহমেদ সুমির কথার কোন পাত্তা দিলোনা, সে বললো, স্যাভলোন আর তুলা?

সুমি ফোরসেপে স্যাভলোনে ভেজা তুলা বাড়িয়ে দিয়ে বললো, না বললে কি হবে, সবাই কিন্তু জানে আপনাদের ব্যাপারটা?

আহমেদ খুব মনোযোগ দিয়ে বাবুলের বুকে নুতন করে ব্যাণ্ডেজ করে, সুমিকে বললো, উনাকে ইনজেকশনটা দিয়ে দিন।

এই বলে, আহমেদ চলে গেলো অন্য রোগীর বেডে।

রাত্রি দিলকে নিয়ে, তিনশ এগার নম্বর কক্ষের বাইরে দরজার কাছাকাছি এসে দাঁড়ালো। সুমি বাবুলকে ইনজেকশন দিতে যেতেই, সে হাত সরিয়ে নিলো। সুমি বললো, ভয় নেই বাবুল ভাই, ইনজেকশন আমি দিতে পারি, দেখবেন একটুও ব্যাথা পাবেন না।

বাবুল বললো, সত্যিই! বিশ্বাস করা যায় তো?

সে তার বালিশের কাছে রাখা নার্স বুকটা টেনে বললো, একটু দাঁড়ান, আমি আগে দেখে নেই।

সে নার্স বুকের পাতা উল্টিয়ে পড়তে থাকলো, ইনজেকশনের সুই থাকতে হবে পনের থেকে বিশ ডিগ্রীর মাঝে।

বাবুলের পড়ার মাঝেই সুমি তার বাহুতে ইনজেকশনের সুইটা ঢুকিয়ে দিলো। বাবুল বললো, হুঁ, সুই ঢুকে গেছে? এঙ্গেল তো ঠিক মতোই আছে দেখি!

সুমি খুবই গর্বের সাথে বললো, বলেছিলাম না।

আহমেদ তখন রতনের চিকিৎসা করছিলো। রতন, সুমিকে ইনজেকশন দিয়ে দিতে দেখে চেচিয়ে বললো, আহমেদ ভাই, দেখেন, দেখেন, সুমি সিস্টার ইনজেকশন দিচ্ছে? বাবুলও কিছু বলছে না।

রতনের চেচানো গলার শব্দে দিল কেঁদে উঠলো। দিলের কান্নার শব্দে সুমির হাতটা কেঁপে উঠলো। ইনজেকশনের সুইটা বাবুলের হাত থেকে সরে আসাতে, সুমি দরজার দিকে তাঁকিয়েই, অনুমান করে ইনজেকশনের সুইটা আবারো ঢুকালো বাবুলের বাহুতে।

বাবুল কঁকিয়ে উঠলো, আহ, ব্যাথায় মরে গেলাম!

বাবুলের হাতে প্রথমবারে সুই ঢুকানোর জায়গা থেকে রক্ত বেড়োতে দেখে, আহমেদ দূর থেকেই চেচিয়ে বললো, সুমি! রক্ত! রক্ত!

রক্ত দেখে সুমি, ভয়ে কিংকর্তব্যবিমূর হয়ে গেলো। তার দূরাবস্হা দেখে, রাত্রি দিলকে শুয়ে থাকা লোকমানের কোলের উপর ফেলে ছুটে আসলো বাবুলের বেডের দিকে।

লোকমানের কোলের উপরে, দিল কেঁদে উঠতেই, লোকমান বিড় বিড় করে বললো, আমার আবার বাচ্চা হলো কি করে?

রাত্রি এসে খুব কড়া ধমক দিলো সুমিকে। সুমিও রেগে বললো, বাচ্চা নিয়ে রোগীদের রুমে এসেছো বলেই তো এই অবস্হা।

অপরদিকে দিল কাঁদতে কাঁদতে, লোকমানের স্যালাইনের পাইপটা ধরে টান দিলো। দিলের টানে স্যালাইনের সুইটা লোকমানের হাত থেকে সরে গিয়ে, কলকলিয়ে রক্ত ঝরতে লাগলো। সে চিৎকার করে উঠলো, আহ, একি অবস্হা?

লোকমানের অবস্হা দেখে রাত্রি ছুটে গেলো সেদিকে। সে দিলকে লোকমানের কোলের উপর থেকে টেনে এনে সুমির কাছে দিয়ে বললো, তুমি আপাততঃ দিলকে দেখো।

দিল সুমির কোলে এসে, কান্নার পরিমান আরো বাড়িয়ে দিলো। সুমি দিলকে কোলে নিয়ে কক্ষের ভেতরে পায়চারী করতে করতে রতনের পাশে এসে দাঁড়াতেই, সে বললো, উঁহ, প্রস্রাবের গন্ধ, পাম্পার্স বদলানোটা উচিৎ না?

প্রস্রাবের কথা বলাতে সুমির খুব ঘিন্না লাগলো, সে দিলকে এনে আবার লোকমানের কোলের উপর রেখে ছুটে বেড়িয়ে গেলো কক্ষ থেকে। রাত্রি সুমিকে ডাকছে, সুমি, সুমি?

অবশেষে, আহমেদ দিলকে নিয়ে নার্স স্টেশনের বিশ্রামাগারে এসে, তার পাম্পার্স বদলাতে গেলো। সেই অবসরে রাত্রি, লোকমান আর বাবুলের স্যালাইন আর ইনজেকশনের পর্বটা শেষ করে আহমেদের কাছে এলো। আহমেদ, দিলের পাম্পার্স বদলে, নুতন একটা পাম্পার্স পরিয়ে নিয়েছে। রাত্রি, ফিডারে করে দিলের দুধ বানিয়ে এনে, আহমেদের হাতে দুধের ফোটা ফেলে বললো, দেখোতো, বেশী গরম নাকি?

আহমেদ কঁকিয়ে উঠলো, করো কি? হাত পুরে গেলো যে?

তারপর, ফিডারের বোতলের দিকে তাঁকিয়ে বললো, দুধের কনাতো গলেনি, দেখো, নীচে কেমন চাকা হয়ে আছে? ভালো করে ঝাকুনি দাও।

রাত্রি ফিডারের বোতলটা দুহাতে ধরে সজোরে ঝাকুনি দিচ্ছিলো।

আশেক বেড়িয়েছে আহমেদের খোঁজে। সে খোঁজতে খোঁজতে, নার্স স্টেশনের বিশ্রামাগারে এসে ঢুকে, গর্জন করে উঠলো, আহমেদ তুমি এখানে?

রাত্রির সজোরে ঝাকুনিতে ফিডারের মুখটা খুলে গেলো। ফিডারের ভেতরের গরম সব দুধগুলো আশেকের মুখে আর গায়ে ছিটিয়ে পরলো। আশেক কঁকিয়ে উঠলো, একি হলো, আমার মুখ পুরে দিলে যে?

রাত্রি আর আহমেদ, আশেকের আবস্হা দেখে, তাড়াতাড়ি হাতের সামনে যা পেলো, তাই দিয়েই আশেকের গা আর মুখ মুছতে লাগলো। আশেকের মুখটা মুছে দেবার সময়, সে কেমন যেনো একটা বিশ্রী গন্ধ পেলো। সে বললো, এটা কি দিয়ে আমার মুখ মুছতেছো?

রাত্রি তার হাতের মুছার জিনিষটার দিকে তাঁকিয়ে দেখলো, সেটা তো দিলের ব্যাবহার করা প্রস্রাবের পাম্পার্স! সে জিভ কাটলো দাঁতে।

আশেক দুজনের কাছ থেকে সামান্য পিছিয়ে গিয়ে গর্জন করে বললো, ডোনট টাচ মী? বোকারা!

সুমির মনের ভেতর দিলের প্রস্রাবের গন্ধটা বেশ তোলপার করছিলো। সে নার্স স্টেশনের বেসিনে বারবার সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে, নাক দিয়ে গন্ধ আছে কিনা শুঁকছিলো। লতিফা অনেকটা তেড়ে এসে বললো, সুমি, রাত্রি কোথায়?

সুমি বললো, জানিনা। হবে হয়তো, রাধিকা সিস্টারের মেয়েকে নিয়ে ঘুরছে?

রাত্রি, দিলকে কোলে নিয়ে ঢুকলো নার্স স্টেশনে। রাত্রিকে দেখে লতিফা বললো, রাত্রি, তিনশ পাঁচের জুবায়ের সাহেবকে ইনজেকশন দেয়ার কথা দশটায়, এখন বাজে এগারটা, দেয়া হয়নি কেনো?

রাত্রি সুমির দিকে তাঁকিয়ে বললো, সুমি, তোমাকে না আমি অনুরোধ করেছিলাম সেগুলো করতে?

সুমি বললো, তুমিই তো একটা ঝামেলা বাঁধালে ঐ বাচ্চাটা এনে।

লতিফা বললো, রাত্রি, তুমি এক কাজ করো তো?

রাত্রি বললো, জী?

লতিফা বললো, আমি দীর্ঘদিন নারী ও শিশু বিভাগে ছিলাম। সেখানকার সুপার আমার খুবই পরিচিত। আমি উনাকে একটা টেলিফোন করে দিচ্ছি। উনি নিশচয়, এই বাচ্চার একটা ব্যাবস্হা করবেন। তুমি এই বাচ্চা নিয়ে সেখানে দিয়ে এসো।

রাত্রি বললো, জী আচ্ছা।

রাত্রি, সাধারন একটা ম্যাডিসিন কার্টে বিছানা পেতে দিলকে শুইয়ে দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে চললো, নারী ও শিশু বিভাগের দিকে। সে প্রায় ক্লান্ত আর অবসন্ন দেহে, অন্যমনস্ক ভাবে এগুচ্ছিলো। বারান্দার মোড়ে ঘুরতেই, অপর পাশ থেকে, একটা খাবারের ট্রলী নিয়ে এগিয়ে আসছিলো কে যেনো একজন নার্স। হঠাৎই, ঐ খাবারের ট্রলীতে ধাক্কা লাগলো, দিলের কার্টটা। ধাক্কায়, রাত্রি নিজের তালও সামলাতে পরলোনা। সে মেঝেতে পরে গেলো। তড়িঘড়ি করে উঠে দাঁড়িয়ে দেখলো, কার্টের উপরে দিল নেই। রাত্রির মাথা খারাপ হয়ে গেলো। সে এদিক সেদিক তাঁকাতে লাগলো। হঠাৎ, দিলের কান্না শোনে, দেখতে পেলো, সকীবও মেঝেতে লুটিয়ে পরে আছে। তার কোলে দিল। রাত্রি এগিয়ে গেলো সেদিকে। বললো, যাক বাঁচা গেলো, যা ভয় পেয়েছিলাম!

সাকীব ধমকে উঠলো, মোটেও বাঁচা যায়নি।

সাকীব রাগে তোতলামী করছে, তো তো তোমার আর বু বু দ্ধি হবে কবে?

সাকীব উঠে দাঁড়াতেই দেখলো কোমরটা কেমন যেনো ব্যাথা করছে। দৌড়ে এসে দিলকে ধরতে গিয়ে নিজেই পরে গিয়েছিলো। কোমরটা আবার ভেঙেই গেলো নাকি?

সন্ধ্যার পর আহমেদ আর রাত্রি খেতে গেলো মুসা মিয়ার দোকানে। খেতে খেতে রাত্রি বললো, বাচ্চা লালন পালন করা কি কঠিন, তাইনা?

আহমেদ কিছু বলছেনা। সে মনযোগ দিয়ে শুনছে রাত্রির কথা।

রাত্রি আবারো বললো, একদিনেই কেমন হিমশিম লাগলো! নিজের বাচ্চা হলে কি করবো আমি?

সে একটু থেমে বললো, আহমেদ ও তো আজকে অনেক কিছু শিখেছো, তাই না? যেমন, পাম্পার্স বদলানো, দুধ বানানো।

আহমেদ বললো, শিখেছি মানে? উপায় ছিলো না দেখে করেছি আর কি।

রাত্রি বললো, তাতেই চলবে, তুমি না বুঝলে আমি বলে দেবো, আমি না বুঝলে তুমি বলে দেবে।

রাত্রি একটু থেমে বললো, ভালো কথা, বিয়ের পর কি আমাকে দিয়ে চাকরী করানোর কথা ভাবছো নাকি?

আহমেদ রাত্রির কথায় অবাক হয়ে তাঁকিয়ে রইলো তার দিকে থ হয়ে।

আহমেদের চাহনি দেখে রাত্রি লজ্জা পেয়ে গেলো। সে হেসে ফেললো, বললো, না না জোক করলাম। তোমাকে একটু ভালো লাগে, তাই বলে যে আমাদের বিয়ে করতে হবে, এমন কোন কথা তো নেই, আর আমি ভাবিও না কখনো।

আহমেদ জোর করে হাসার চেষ্টা করলো, বললো, তোমার কথার কোনটা যে জোক, কোনটা যে সিরীয়াস, বুঝা কষ্টের।

রাত্রি কিছু বললো না। সে খিল খিল করে হেসে খাবারে মনযোগ দিলো।

দিলকে নিয়ে বাড়ীতে ফিরে এলো সাকীব। ঘরে ঢুকেই সে বিড়বিড় করে বললো, কেনো যে রাত্রির মতো একটা দায়ীত্বহীন মেয়ের কাছে দিলের ভার দেয়া হয়?

সাকীবকে ফিরতে দেখে, রাধিকা বললো, নার্স স্টেশনের কি অবস্থা?

সাকীব দিলকে বেবী বেডে শুইয়ে দিতে দিতে বললো, হুম ভালোইতো চলেছে দেখলাম।

রাধিকা বললো, অনেক অঘটন ঘটেছে নিশচয়?

সাকীব বললো, নাহ, চমৎকার চালিয়েছে তো লতিফা!

রাধিকা বললো, তাহলে সবাইকে নিশচয় ইচ্ছেমতো বকাঝকা করেছে, তাইনা?

সাকীব কিছুক্ষন চুপচাপ থেকে বললো, রাধিকা, তুমি যতটা লতিফাকে অকাজের মনো করো, সে ততটা না। আমার কি মনে হয় জানো? লতিফার চোখে ঐ কালো মোটা ফ্রেমের চশমা টা না থাকলে, তার রূপে, সারা হাসপাতালে একটা চমক পরে যেতো!

রাধিকা রাগ করলো, বললো, এতই যদি লতিফাকে ভালো লাগে তোমার, তাহলে বিয়ে করে ফেললেই পারো।

রাধিকা ঘুরে উবু হয়ে শুলো।

সাকিব বিব্রত বোধ করলো, বললো, রাধিকা ছেলেমানুষী কথা বলবেনা।

জ্বরে পরে কয়েকটা দিন ছুটি কাটিয়ে দম বন্ধ হয়ে আসছিলো রাধিকার। সকালে ঘুম থেকে উঠে মাথাটা খুব হালকা হালকা লাগাতে রাধিকা ঠিক করলো, কাজে যাবে। সে দিলের কাপর চোপর, দুধের সরঞ্জাম গুছিয়ে বেড়োনোর উদ্যোগ করছিলো। সাকীব বললো, তোমার জ্বর তো ভালো করে সারেনি এখনো? আর কয়টা দিন বিশ্রাম নিলে হতোনা?

রাধিকা বললো, আমার শরীর আমি ভালো বুঝি। তোমাকে ভাবতে হবে না।

সাকীব বললো, তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু দিলের দেখাশুনারও তো একটা ব্যাপার আছে। এভাবে যার তার হাতে মেয়েকে রেখে না জানি কি বিপদ হয় আমার।

রাধিকা বললো, যার তার হাতে বলছো কেনো? সবাই আমার জানাশোনা।

সাকীব বললো, তোমার কাছে ঐ চাকরী আর দিল, কোনটা বড়?

রাধিকা বললো, দুটোই, আমি সংসার ধর্ম পালন করে, নার্সের কাজটাও চালিয়ে, দেখিয়ে দিতে চাই, মেয়েরা কোন অংশে কম না।

সাকীব রাগ করলো, আহা তুমি বুঝতে পারছোনা?

টেলিফোন টা বেজে উঠলো। সাকীব রিসীভ করলো। টেলিফোনে কথা শেষ হতেই, সাকীব রাধিকাকে বললো, দিলকে আজ তোমকেই দেখতে হবে। ম্যাটার্নিটির যে নার্সটা দিলের দেখাশোনা করতো, সে আজ ছুটিতে আছে।

এই বলে সাকীব বেড়িয়ে গেলো।

রাতের ডিউটি ছিলো রাত্রির। সকালে বাসায় ফিরে জানালার পর্দা টেনে, ঘর অন্ধকার করে, চোখে তোয়ালে পেঁচিয়ে ঘুমোনোর উদ্যোগ করলো রাত্রি। ঠিক তখুনি দরজায় নক হতেই বিরক্ত হলো সে। চোখে মুখে এক ধরনের বিরক্তি নিয়ে দরজা খুললো রাত্রি। দরজা খুলতেই, দিলকে কোলে নিয়ে হন হন করে ভেতরে ঢুকলো রাধিকা। রাত্রি কিছুই বুঝতে পারছেনা। রাধিকা রাত্রির বিছানার উপর দিলকে শুইয়ে দিয়ে বললো, তোর তো রাতের ডিউটি ছিলো, সারাদিন তো বাসাতেই থাকবি। দিলকে একটু দেখবি।

রাত্রি অবাক হয়ে বললো, একি? আমি পারবোনা, আমি টায়ার্ড, ঘুমে আমার চোখ ফেটে যাচ্ছে।

রাধিকা তার কাঁধের ব্যাগটা টেবিলের উপর রেখে, হাতের অন্য একটা পলিথিনের ব্যাগ রাত্রির হাতে দিয়ে বললো, টসটসে পেয়ারা আছে কয়েকটা। খেয়ে নিবি। আমি গেলাম।

রাত্রি, রাধিকার হাত টেনে ধরলো, বললো, বললেই হলো নাকি? ঐদিন দিলের জন্যে কতটা ঝামেলা আমার উপর দিয়ে গেছে, তুমি ভাবতে পারোনা।

রাধিকা বললো, দিলের দেখাশোনা করতে করতে, সুমিকে দেখাশোনা করার একটা ভালো বুদ্ধি পেয়ে যেতে পারিস।

রাত্রি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো, ভালো বুদ্ধি?

সেই ফাঁকে রাধিকা পালানোর চেষ্টা করলো। রাত্রি পেছন থেকে ডাকতে লাগলো। রাধিকা, রাত্রির কোন দোহাই না শোনে হন হন করে বেড়িয়ে গেলো।

সকাল থেকেই, সাকীব আর আহমেদ নার্স স্টেশনে এসে, রোগীদের নার্স রিপোর্টগুলো চেক করছিলো। লতিফা এই কয়দিনের অভ্যাস মতো, নার্স স্টেশনে ঢুকেই নার্সদের উদ্দ্যেশে বললো, সবাই দেখছি ঠিক সময়ে এসেছো।

লতিফা নার্স সুপারভাইজারের চেয়ারটাতে বসে বললো, ঠিক আছে, এবার তোমাদের আজকের দিনের কাজগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছি।

ঠিক তখুনি রাধিকা নার্স স্টেশনে ঢুকতে ঢুকতে বললো, স্যরি, একটু লেইট হয়ে গেলো আজকে।

সাকীব আবাক হয়ে বললো, তুমি?

লতিফা বললো, আরে, রাধিকা সিস্টারের জ্বর কি ভালো হয়ে গেছে নাকি?

রাধিকা বললো, হুম।

রোকেয়া বললো, এত তাড়াতাড়ি? ভালো হয়ে গেলেও তো ছুটি পেলে সবাই একটু বিশ্রাম করে।

সাকিব বললো, দিল কোথায়?

রাধিকা কারো কথার কোন পাত্তা দিলোনা। সে লতিফার হাত থেকে দৈনিক কর্মসূচীর খাতাটা টেনে নিয়ে বললো, সবার কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছি আমি।

লতিফা চেচিয়ে বললো, অফিসিয়ালী আজকে, আমি সুপারভাইজার!

রাধিকা বিনয়ের সাথে বললো, স্যরি ছুটি নিয়ে তোমাকে মনে হয়, খুব ঝামেলায় ফেলে দিয়েছিলাম।

লতিফা বললো, মোটেও না।

সাকীব আবারো বললো, দিল কোথায়?

রাধিকা সাকীবের কথা শোনছেনা। সে লতিফাকে বললো, কারো কোন সমস্যা হয়নিতো এই কয়দিনে?

সাকীব গর্জন করে উঠলো, আমি বলছি, দিল কোথায়?

রাধিকা চেচিয়ে বললো, রাত্রির কাছে।

সাকীব মাথায় হাত দিয়ে বললো, বলো কি? ঐ ঐ?

সাকীব তোতলামী করতে লাগলো।

লতিফা বললো, আমি যদি মা হতাম, তাহলে ঐ রাত্রির মতো একটা মেয়ের কাছে কখনো নিজের মেয়ের দেখাশোনার ভার দিতাম না।

রাধিকা ফিশ ফিশ করে বললো, আগে তো বিয়ে? তারপরই না মা হবার কথা আসবে।

সাকীব রাগে থর থর করছে, সে অনেকটা মাতালের মতো আহমেদকে ইশারা করলো, রিপোর্টগুলো তুমি দেখো।

সাকীব নার্স স্টেশন থেকে বেড়িয়ে গেলো।

রাধিকা রোগীদের প্রতিটি কক্ষে একটা টহল দিয়ে, একজন একজন করে সবার খোঁজখবর নিয়ে ফিরে এলো নার্স স্টেশনে। ফিরে এসে, সে আবারও নার্স রিপোর্টগুলো চেক করে বললো, তিনশ আটের ফাহাদ সাহেবের স্যালাইন বদলানো হয়েছে?

তাহমিনা বললো, জী।

রাধিকা আবারো বললো, তিনশ বারোতে নিয়াজ সাহেবের ইনজেকশন দেয়া হয়েছে?

সাজেদা বললো, জী।

রাধিকা আবারো বললো, তিনশ এগারোর লোকমান সাহেবের স্যালাইন?

রোকেয়া বললো, ভুলে গিয়েছিলাম।

রাধিকা কটমট করে তাঁকালো তার দিকে।

রোকেয়া বললো, এক্ষুনি যাচ্ছি।

রাধিকা আবারো বললো, তিনশ পাঁচের ইনটেনসীভ কেয়ারে যে আছে, তার প্রস্রাব পায়খানার কি অবস্হা?

লতিফা বললো, তা আমি নিজেই করেছি, দুঃশিচন্তার কোন কারন নাই।

টেলিফোনটা বেজে উঠলো। রাধিকা রিসীভার ধরে বললো, সার্জারী বিভাগ থেকে বলছি।

টেলিফোনের কথাগুলো শুনে রাধিকার চেহারা কেমন যেনো ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো।

রাধিকা বললো, ঠিক আছে।

সে রিসীভার রাখতেই, তাহমিনা বললো, কি ব্যাপার?

রাধিকা বললো, ঢাকা চিটাগং রোডে এক্সিডেন্ট হয়েছে। স্ট্রেচার, ফার্ষ্ট এইড বক্স, এসব নিয়ে জরুরী বিভাগে যাও সবাই। তাড়াতাড়ি! হুর হুর করে এম্বুলেন্স এসে ঢুকবে একটার পর একটা।

সুমির আজ বিকালের ডিউটি। নেট ওয়ার্ক এডমিনিস্ট্রেটর বলে পরিচয় দেয়া, তুফানকে দেখে মনে হয়, সারাদিন তার বিশেষ কোন কাজ থাকেনা। সে আজও দুপুর বেলা থেকে, সুমিকে হাসপাতালে পৌঁছে দেবে বলে গাড়ী নিয়ে এলো। বিকাল চারটা পর্যন্ত্য গল্প গুজব করে সে বললো, আমার হাসপাতালে যাবার সময় হয়ে গেছে।

নব্য বাংলা প্রতীক হাসপাতালের কাছাকাছি আসতেই, তুফানের গাড়ীর ইঞ্জিনটা বন্ধ হয়ে গেলো, রাস্তার ঠিক মাঝখানে। পেছন থেকে সাইরেন বাজিয়ে একটা এম্বুলেন্স এসে থামলো। ড্রাইভার চেচিয়ে বলছে, এই লাল গাড়ী, রাস্তা থেকে গাড়ী সরান।

তুফান বিড় বিড় করলো, আমি তো চাইছি, ইঞ্জিন স্টার্ট না নিলে করবো কি?

সুমি বেশ বিরক্ত হলো, তুফানের উপর। সে গাড়ীর দরজা খুলে বেড় হয়ে বললো, আমি গেলাম।

দিলের কান্না থামাতে সাংঘতিক কষ্ট হয়েছে রাত্রির। সে রাধিকার রেখে যাওয়া ব্যাগের ভেতর থেকে সব বেড় করে, দিলের জন্যে বেবী ফুড তৈরী করে আনলো। অথচ, দিল কিছুই মুখে দিচ্ছে না। রাত্রি নিজের জিভে নিয়ে একবার চেটে দেখলো, খুবই টেষ্টী লাগলো তার কাছে। দিল খাচ্ছে না দেখে রাগ করে সে নিজেই বেবী ফুড সবটা খেয়ে ফেললো। তারপর নানান রকমের অঙ্গ ভঙ্গী দেখানোর এক পর্যায়ে ঘুমিয়ে পরলো দিল।

দিল ঘুমুতেই রাত্রি টেবিলের পাশে চেয়ারে এসে বসলো। নিজের অজান্তেই সে টেবিলের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পরলো একসময়। হঠাৎ তার ঘুম ভাঙতেই লক্ষ্য করলো, দিল কেমন যেনো ছটফট করছে। সে বমি করতে চাইছে, অথচ পারছেনা। রাত্রির মনে হলো, দিলের গলায় কি যেনো অটকে আছে, তাতে করে সে খুব কষ্ট পাচ্ছে।

রাত্রি বলছে, দিল কি হয়েছে, কি হয়েছে তোমার সোনামনি?

দিল কেবল ছটফট করছে আর গলার ভেতর থেকে কি যেনো বের করতে চাইছে তার ছোট দেহটা নাড়িয়ে চাড়িয়ে।

হঠাৎই রাত্রির চোখে পরলো, দিলের জামার একটা বোতাম নাই। রাত্রির নার্ভাস হয়ে পরলো। সে নিজে নিজেই বিড় করে বললো, যা ভাবিনি তাই? এখন কি হবে? এম্বুলেন্স? এম্বুলেন্স?

রাত্রি দিশাহারা হয়ে ঘরের ভেতর ছুটাছুটি করছে। সে বার কয়েক টেলিফোন করলো হাসপাতালে। কেউ ধরছেনা। সে কাঁদতে লাগলো, রাধিকা সিস্টার আমাকে ক্ষমা করো তুমি।

রাত্রি কাঁদতে কাঁদতে নিজে নিজেই বললো, এখন কাঁদার সময় না।

রাত্রি দিলকে কোলে নিয়ে ঘর থেকে বেড়িয়ে পরলো।

নব্য বাংলা প্রতীক হাসপাতালের সামনে, একের পর এক এম্বুলেন্স এসে থামছে। হাসপাতালের সমস্ত ডাক্তার আর নার্সেরা এসে আহত মানুষগুলোকে ধরে ধরে ভেতরে নিয়ে চলছে। সাকীব সবচেয়ে গুরুতর ভাবে আহত লোকটাকে নিয়ে ব্যাস্ত হয়ে পরলো। আহমেদ তাকে সাহায্য করছে। রাধিকা নিজ বিভাগের সব নার্সদের বিভিন্ন আহতদের পাশে ব্যাস্ত থাকা ডাক্তারদের বুঝিয়ে দিয়ে, সাকীবকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো।

সুমি হাসপাতালে ঢুকে, এতসব রক্তাক্ত আহতদের দেখে নার্ভাস হয়ে গেলো। সে মাথা ঘুরে পরে যেতে উপক্রম হলো। মিনা রায় আহত একটা সাত আট বছরের মেয়েকে কোলে নিয়ে সুমির সামনে দিয়ে যাচ্ছিলো। সুমিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে বললো, সুমি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি করছো। ঐ দেখো, ঐ রোগীটার পাশে কেউ নাই। তার জন্যে কিছু একটা করো।

মিনা রায় চলে গেলো। রাধিকার কাছে এসে সাত আট বছরের মেয়েটাকে তার কোলে দিয়ে বললো, এখানে আহমেদ আছে, নার্সের দরকার নাই। তুমি এই মেয়েটাকে দেখো। মাথায় জখম পেয়েছে। খুবই সাবধান।

রাধিকা সাত আট বছরের মেয়েটাকে নিয়ে পাশের বেডে ব্যাস্ত হয়ে পরলো।

রাত্রি দিলকে নিয়ে সরাসরি নারী ও শিশু বিভাগে চলে এলো। সেখানকার কর্তব্যরত নার্সকে সব বুঝিয়ে বলে অনুরোধ করলো, তাড়াতাড়ি দিলকে ডাক্তার দেখানোর জন্যে। রাত্রি দিলকে কর্তব্যরত ঐ নার্সটিকে বুঝিয়ে দিয়ে, আর দেরী করলোনা। সে ছুটে গেলো সার্জারী বিভাগে রাধিকাকে খোঁজতে। সার্জারী বিভাগের কর্তব্যরত নার্স বললো, সবাই এখন জরুরী বিভাগে। রাত্রি জরুরী বিভাগে এসে আহতদের পাশ কেটে ছুটতে লাগলো রাধিকাকে খোঁজে বেড় করার জন্যে। রাধিকাকে খোঁজে পেয়ে সে কাঁদতে কাঁদতে বললো, সিস্টার, দিলের গলায় একটা বোতাম আটকে গেছে। এখন শিশু বিভাগে রেখে এসেছি। তুমি তাড়াতাড়ি চলো।

রাত্রির কথা শুনে রাধিকার মাথায় যেনো বাজ নেমে পরলো। সে বোবার মতো তাঁকিয়ে রইলো রাত্রির দিকে।

সাকীব পাশ থেকে শুনছিলো রাত্রির কথা। সে একবার শুধু তাকালো রাত্রির দিকে। সাকীবকে দেখে রাত্রি তার দিকে এগিয়ে গেলো। বললো, সাকীব ভাই, প্লীজ একবার দিলের অবস্হাটা দেখে যান।

সাকীব ধমক দিলো, দেখছোনা কাজ করছি।

সাকীবের ধমক শুনে রাত্রি যতটা না কাতর হলো, রাধিকা হলো তার চাইতে অনেক বেশী। সে রাত্রির দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে, বেডের উপর শোয়ানো সাত আট বছরের মেয়েটার চিকিৎসায় ব্যাস্ত হয়ে পরলো। রাত্রি নাছোড়বান্দা হয়ে রাধিকার হাত টানতে লাগলো। আর, কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলো, সিস্টার, প্লীজ, আমার কথা শোনো। প্লীজ!

রাধিকার চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পরছে। অথচ, সে নড়ছেনা মোটেও।

দূর থেকে রাত্রির এই ধরনের এবনরমাল একটা ব্যাপার চোখে পরলো মিনা রায়ের। সে এগিয়ে এসে বললো, কি ব্যাপার?

রাত্রি কাঁদতে কাঁদতে সব খোলে বললো মিনা রায়কে। মিনা রায় রাধিকাকে বললো, এই মেয়েটির ভার আমাকে ছেড়ে দাও। তুমি যাও রাধিকা, রাত্রির সাথে।

রাধিকা তার মাথার উপর থেকে নার্স ক্যাপটা খুলে নিয়ে, হু হু করে কাঁদতে লাগলো। বললো, স্যরি ম্যাডাম।

রাধিকা রাত্রির সাথে শিশু বিভাগের দিকে ছুটতে লাগলো।

শিশু বিভাগে পৌঁছুতেই দেখলো কর্তব্যরত ডাক্তার দিলের গলার ভেতর থেকে হলদে রংয়ের একটা বোতাম বেড় করে এনেছে মাত্র। তারপর অক্সিজেন পাম্প দিয়ে দিলের নাকে পাম্প করতে লাগলো। রাধিকা আর রাত্রি প্রার্থনা করতে লাগলো অচেতন মনে। এক মুহুর্তে দিল কেঁদে উঠলো। কর্তব্যরত ডাক্তার বললো, আর কোন ভয় নেই। আপনাদের বাচ্চা এবার নিয়ে যেতে পারেন।

রাত্রি রাধিকাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো, স্যরি, আমার দোষে, আজকে দিলের এত কষ্ট হয়েছে।

রাধিকা বললো, না রাত্রি না, তোমার কোন দোষ নেই। তুমি যা করেছো, তা আমি কক্ষনো ভুলতে পারবোনা।

রাধিকা তারপর শিশু বিভাগের কর্তব্যরত নার্সকে বললো, জরুরী বিভাগে প্রচুর আহত রোগী, আপনি কি দয়া করে আর কিছুক্ষণ আমার মেয়েটিকে দেখবেন?

নার্সটি বললো, ঠিক আছে।

রাধিকা খুশী হয়ে বললো, চল রাত্রি।

রাত্রি বললো, কোথায়?

রাধিকা বললো, কোথায় আবার? দেখিসনি কত আহত কষ্ট পাচ্ছে?

রাত্রি বললো, হুম চলো।

রাধিকা আর রাত্রি ছুটতে থাকলো জরুরী বিভাগের দিকে।

চলবে